গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ৬ সংখ্যা | ৬ - ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

এনআরসি-র নামে আসামের লক্ষ লক্ষ মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত ব্যর্থ করুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছেন, তথাকথিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) থেকে আসামে ১৯ লক্ষের বেশি মানুষের নাম বাদ দেওয়ার ঘটনায় আমরা গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন। কেন্দ্রীয় এবং আসাম রাজ্য সরকার অসৎ উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই পরিকল্পনা রচনা করেছে। উগ্র জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িক ও জাতিবিদ্বেষী শক্তির নির্দেশেই তাদের এই ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ। এর দ্বারা ধর্ম, বর্ণ, জাত-পাত, সম্প্রদায় ও ভাষাকে ভিত্তি করে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি হবে। এনআরসি থেকে বাদ যাওয়া সহায়-সম্বলহীন মানুষগুলির জীবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। নিপীড়িত মানুষের ঐক্য ধ্বংসকারী এই পদক্ষেপ শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির হাতকে শক্তিশালী করে তাদের নির্মম শোষণমূলক ব্যবস্থাকে দীর্ঘায়িত করবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে দাবি করছি, বহু বছর ধরে আসামে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভারতীয়ের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার এই চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে। এ কাজে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে বাধ্য করতে দেশজোড়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। জনগণের কাছে আমরা আবেদন করছি, আরএসএস-বিজেপি পরিচালিত এই দূরভিসন্ধিমূলক এনআরসি অন্যান্য রাজ্যেও চালু করার অপচেষ্টা ব্যর্থ করুন।

অর্থনীতিকে বাঁচানোর নামে পুঁজিপতিদেরই বাঁচাচ্ছে বিজেপি সরকার

অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা গোপন করে এতদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর অনুগামীরা জোরের সাথে বলে এসেছেন, ভারতীয় অর্থনীতির কোনও সংকট নেই, অর্থনীতির ভিত্তি খুবই মজবুত। কিন্তু অর্থনীতির মারাত্মক রোগটি শেষ পর্যন্ত প্রকট আকারে বেরিয়েই পড়ল।

রোগটির নাম মন্দা, যা আসলে চাহিদার সংকট। ৩০ আগস্ট কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর (এনএসও) প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে দেশের মোট উৎপাদন অর্থাৎ জিডিপি বৃদ্ধির হার ব্যাপক পরিমাণ কমে ছ'বছরে সর্বনিম্ন ৫ শতাংশে ঠেকেছে। জানুয়ারি-মার্চ এই ত্রৈমাসিকেও যা ছিল ৮.১ শতাংশ। মূলত কল-কারখানার উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে যাওয়াতেই অর্থনীতির এই দুর্দশা।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর থেকে শুরু করে সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি, নীতি আয়োগের কর্মকর্তা থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা, সকলেই স্বীকার করছেন, ভারতের অর্থনীতি মন্দার করাল গ্রাসে। গাড়ি শিল্প থেকে শুরু করে আবাসন শিল্প, বিস্কুট থেকে অন্যান্য ভোগপণ্য প্রত্যেকটির উৎপাদন যেভাবে কমছে, সাময়িক বা স্থায়ীভাবে কর্মী ছাঁটাই চলছে, তাতে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির মানা না মানার উপর আর মন্দার তীব্রতা দাঁড়িয়ে নেই— ভারতীয় অর্থনীতি মন্দার গ্রাসে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অর্থনীতির এই মরণ দশার কথা কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও রোগ সারাতে হেকিমি-কবিরাজি থেকে তাগা-তাবিজ বাঁধা সবই শুরু করে দিয়েছে। প্রথম ধাপে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন

দুয়ের পাতায় দেখুন

নেতাজি-ভগৎ সিংয়ের অবমাননা রুখল দিল্লির ছাত্ররা

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদী ছাত্রদের গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। খবর দুয়ের পাতায়

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান ডিএসও রাজ্য সম্মেলনে

৩১ আগস্ট কোচবিহার শহরে এআইডিএসও-র রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশের একাংশ। সংবাদ আটের পাতায়

নেতাজি-ভগৎ সিংয়ের অবমাননা রুখে দিল দিল্লির ছাত্ররা

বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি চেষ্টা করেছিল মহান বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিংয়ের সাথে ব্রিটিশের কাছে দাসখত লিখে মুক্তি পাওয়া সাভারকারকে একাসনে বসাতে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা।

ঘটনার সূত্রপাত ২০ আগস্ট, যখন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টির গেটের সামনে এবিভিপি নেতাজি এবং ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে সাভারকারকে জুড়ে আবক্ষ মূর্তি বসিয়ে দেয়। এর প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও এবং অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দিয়ে প্রতিবাদ জানায়। ডি এস ও ঘোষণা করে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এই তিনজনের জীবন ইতিহাস তুলে ধরে জনসভা করা হবে। 'স্টুডেন্টস অ্যান্ড হ্যাসট্যাগ ৯' নামে সংগঠন তৈরি হয় এবং ছাত্ররা সাভারকারের মূর্তি নেতাজি-ভগৎ সিংয়ের পাশ থেকে সরানোর দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। বেশ কয়েকবার এবিভিপি-আরএসএসের গুন্ডারা দিল্লি পুলিশের সাহায্যে এই আন্দোলনের উপর আক্রমণ চালায়। প্রচারের ব্যানার ছিঁড়ে দিয়ে, ছাত্রছাত্রীদের মারধর করে। কিন্তু ছাত্ররা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন, সাভারকার আন্দামানের জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে বেশ কয়েকবার মুচলেকা দিয়ে বলেছিলেন, তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলে তিনি ব্রিটিশের অনুগত হয়ে থাকবেন এবং কোনও দিন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেবেন না।

১৯২১ সালে এই দাসখতের ভিত্তিতে মুক্তি পেয়ে তিনি বাস্তবিকই কোনও দিন আর স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেননি। তিনি যে সংগঠন এবং বিশ্বাসের অংশ ছিলেন সেই আর এস এস এবং হিন্দু মহাসভা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 'বিশ্বাসঘাতক', 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলত।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র যখন আজাদ হিন্দ বাহিনীকে নিয়ে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত, সাভারকার তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশকে সাহায্য করতে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করেছেন। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের লড়াইকেও নিন্দা করেছেন। অন্য দিকে ভগৎ সিং তাঁর জীবন উৎসর্গ করার আগে 'দয়াভিক্ষার'-আবেদন ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে বড়লাটের কাছে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন ক্ষমতা থাকলে ব্রিটিশ সরকার আমাকে যুদ্ধবন্দি হিসাবে কামানের মুখে উড়িয়ে দিক। শহিদ ভগৎ সিং ছিলেন 'নাস্তিক', সুভাষচন্দ্র ছিলেন 'ধর্মনিরপেক্ষ'। আর সাভারকার ছিলেন হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক। মহম্মদ আলি জিন্নার ১৬ বছর আগেই সাভারকর হিন্দু আর মুসলমানকে দুই আলাদা জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে 'দ্বিজাতি' তত্ত্বের জন্ম দেন, যার বিষময় ফল আজও ভারতবাসী বহন করে চলেছে। এই সাভারকরকেই নেতাজি-ভগৎ সিং-য়ের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী সাজাতে চেয়েছিল এবিভিপি।

এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দৃঢ়ভাবে বলেন সাভারকারের মতো একজন চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী ব্যক্তিকে নেতাজি এবং ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে একাসনে বসানো চলবে না। অবশেষে ছাত্রদের দাবি মেনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মূর্তি সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। এই জয়ের জন্য ছাত্রদের অভিনন্দন জানিয়ে এ আই ডি এস ও স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার মহান বিপ্লবীদের জীবন চর্চার আহ্বান জানায়। কারণ এর মধ্য দিয়েই বিজেপির সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে পরাস্ত করা সম্ভব।

পুঁজিপতিদেরই বাঁচাচ্ছে বিজেপি

একের পাতার পর

বেশ কিছু টোটকা ঘোষণা করেছেন। যেমন ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারি তহবিল থেকে ৭০ হাজার কোটি টাকার জোগান দেওয়া, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও হাউজিং ফিনান্স কর্পোরেশনকে বাড়ি-গাড়ি কেনার জন্য আরও ২৫ হাজার কোটি টাকা দেওয়া, বাজেটে অতি ধনীদের উপর যে অতিরিক্ত সারচার্জ বসানো হয়েছিল তা প্রত্যাহার করে নেওয়া, কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়া, সরকারি দপ্তরের সমস্ত পুরনো গাড়ি বাতিল করে নতুন গাড়ি কেনার মাধ্যমে খানিকটা চাহিদা তৈরি করা, অতিকায় ধনকুবের কর্পোরেট সংস্থাগুলির মোট মুনাফার যে ২ শতাংশ সামাজিক উন্নয়নে খরচ করার কথা অর্থাৎ কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর), তা লঙ্ঘন করলেও সেটিকে আর অপরাধ হিসাবে গণ্য না করা, শ্রমিকদের পাওনাগণ্ডা আত্মসাৎ করা সহ শ্রমিক বিরোধী নানা ভূমিকার কারণে শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ১৪০০ মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া ইত্যাদি ৩২ দফা দাওয়াইয়ের কথা বলা হয়েছে ধুঁকতে থাকা ভারতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির আয়ুষ্কাল কিছুটা দীর্ঘায়িত করার জন্য।

কিন্তু তাতেও অর্থনীতি কতটা শ্বাস নিতে পারবে সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের নিজেদের মধ্যেই। তাই এই ঘোষণার দিন পাঁচেকের মাথাতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা আরও কিছু দাওয়াই ঘোষণা করেছে। যেমন, দেশের কয়লাখনিতে ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নির রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে দেশের কয়লাখনি থেকে কয়লা তুলে বিক্রি করতে পারবে বিদেশি সংস্থাগুলি। ডিজিটাল মিডিয়াতেও ২৬ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু এ সবের দ্বারা কতটুকু বিদেশি লগ্নি আসবে তা নিয়ে আর্থিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যেই রয়েছে বহু ধন্ধ। কারণ গোটা বিশ্বেই মন্দা। তবুও রপ্তানি বাড়ানোর কথা বলে সিঙ্গল ব্র্যান্ড রিটেলে বিদেশি সংস্থাগুলিকে অন লাইনে বিক্রির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ দেশে দোকান বা শো রুম খোলার যে শর্ত এ ক্ষেত্রে আগে ছিল তা-ও তুলে নেওয়া হয়েছে। চিনিকল মালিকদের ৬,২৬৮ কোটি টাকা ভরতুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কিন্তু এতে চাহিদা কতটুকু বাড়বে? এ ভাবে ঠেকনা দিয়ে কি পক্ষাঘাতগ্রস্ত অর্থনীতিকে দাঁড় করানো সম্ভব?

সরকার পুঁজিপতিদের জন্য যে এত আর্থিক ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করে চলেছে, তার জন্য টাকা পাবে কোথা থেকে? দুটো পথ খোলা— এক) জনগণের উপর বাড়তি ট্যাক্স চাপানো, দুই) রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানা-সম্পত্তি বিক্রি করা। দুটো প্রক্রিয়াই অবশ্য সরকার চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২৫টি বিমানবন্দর বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছে। যে ছ'টি বিমানবন্দর ইতিমধ্যেই বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তার পাঁচটি পেয়েছে বিজেপি ঘনিষ্ঠ আদানি গোষ্ঠী। প্রতিরক্ষা শিল্পেও বেসরকারিকরণের লক্ষ্য নিয়ে চলেছে সরকার। সেগুলির দখল নেবে আম্বানি, আদানি, টাটা, মাহিন্দ্রা সহ একচেটিয়া পুঁজিপতির দল। আরও বহু ক্ষেত্রে সরকার বেসরকারিকরণের নীতি নিয়ে চলছে। রেলের বিপুল পরিমাণ জমি বেচে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। একের পর এক ট্রেন বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। টিকিটে ভরতুকি ছাঁটাই করা হচ্ছে। ছাঁটাই হতে চলেছেন প্রায় ৩ লক্ষ রেল কর্মচারী।

কিন্তু এভাবে জনগণের উপর ক্রমাগত ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে, সরকারি সম্পত্তি বেচে অর্থনীতিকে কতদিন অক্সিজেন জোগানো সম্ভব? মুমূর্ষু অর্থনীতিকে বাঁচানোর নামে সরকার যা দিচ্ছে তা তো সবই পুঁজিপতিদের পকেটে যাচ্ছে। অর্থনীতির এই সংকটটা কি পুঁজির অভাবে? বাস্তবে সংকটটা তো উৎপাদনের নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর থাকাকালীন মন্দার অবস্থা বোঝাতে রঘুরাম রাজন বলেছিলেন যে, দেশের মোট উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহার হচ্ছে। অর্থাৎ দেশের মানুষের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সামান্যতম অংশ না মেটা সত্ত্বেও দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকছে। তা হলে সংকটটা তো বাজারের। কারণ বাজারে ক্রেতা নেই। এই ক্রেতা কারা? দেশের জনগণ। সেই জনগণ এমনই আর্থিক দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে যে তাদের শিল্পদ্রব্য কেনার মতো ক্ষমতাই নেই। তা হলে তো সরকারের উচিত জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করা। সরকার তা করছে না কেন? কেন তাদের উপর চাপাচ্ছে আরও ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি, করের বোঝা?

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। সেই কৃষির অবস্থা কী? কৃষি অর্থনীতিও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীন হওয়ায় কৃষকরা ফসলের যা দাম পায় তাতে বিপুল খরচ মিটিয়ে তাদের হাতে অধিকাংশ সময়ই কিছু থাকে না। বরং ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে ধান, আলু, আখ, তুলো, সয়াবিন চাষিরা লাখে লাখে আত্মহত্যা করছে। এরই ফলে দেশের গ্রামীণ বাজার ধুঁকছে। সরকার বাজার চাঙ্গা করতে চাইলে তো সার বীজ কীটনাশক বিদ্যুতের দাম কমিয়ে ফসলের লাভজনক দামের ব্যবস্থা করত। তা কেন করছে না? মোটর গাড়ি থেকে ভোগ্যপণ্য, উৎপাদন শিল্পে মন্দা মারাত্মক আকার নিয়েছে। লক্ষ লক্ষ কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে। যা বাজারকে আরও সংকুচিত করে দিচ্ছে। যাদের এখনও কাজ আছে তাদের জন্য সরকার কতটুকু বেতন বরাদ্দ করেছে? দৈনিক ১৭৮ টাকা। এই বিরাট অংসগঠিত শ্রমিকরা তো বাজারেরই অংশ। সরকার বাজার চাঙ্গা করতে চাইলে তো শ্রমিক শ্রেণির বেতন বাড়িয়ে তাঁদের হাতে আরও বেশি অর্থের জোগানের ব্যবস্থা করত। তা তো কই করল না! দেশে বেকারি বৃদ্ধির হার গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ হয়েছে। এই কোটি কোটি বেকারের ক্রয়ক্ষমতা তো প্রায় কিছুই নেই। এঁদের জন্য সরকার কী ব্যবস্থা করল? কিছুই না। জনগণের হাতে অর্থ জোগানোর পরিবর্তে পুঁজিপতিদের পকেটেই আরও অর্থ ঢেলে চলেছে সরকার। যা আসলে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা ছাড়া আর কিছু নয়। এর দ্বারা বাজার চাঙ্গা হতে পারে কি? অবশ্য সরকারি ত্রাণ প্রকল্পে পুঁজিপতিদের মুনাফার ঘাটতি মিটে যাবে। তার মানে মন্দার আক্রমণে পুঁজিপতিদের কোনও ক্ষতি নেই। বরং সরকারি বদান্যতায় তাদের লাভ অটুট থাকবে। মন্ত্রী-আমলা-অফিসারদের গায়ে মন্দার আঁচ লাগবে না। ছাঁটাই শ্রমিক, অভুক্ত কৃষকের করের অর্থে তাদের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-তে কোনও ঘাটতি পড়বে না। মন্দার ফল ভোগ করবে শুধু শ্রমিক-কৃষক সহ মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-দরিদ্র জনগণ।

আসলে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিপতি শ্রেণির অর্থে পরিপুষ্ট তাদেরই পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বুর্জোয়া দলগুলি ও তাদের সরকার পুঁজিপতিদেরই স্বার্থ দেখে, জনগণের নয়। তাই ত্রাণপ্রকল্প পুঁজিপতিদের জন্যই বরাদ্দ হচ্ছে, জনগণের জন্য নয়। জনগণের উপর চাপছে আরও বোঝা। এই অবস্থায় শ্রমিক-কৃষক সহ জনগণের কর্তব্য কী? তারা কি শুধু পড়ে পড়ে মার খাবে? না। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। বাঁচার দাবিগুলি নিয়ে গড়ে তুলতে হবে তীব্র আন্দোলন। সরকারকে বাধ্য করতে হবে দাবি মানতে। শোষিত মানুষ যাতে সরকার এবং পুঁজিপতি শ্রেণির এই জঘন্য স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়াতে না পারে তার জন্যই তাদের ধর্মে-বর্ণে ভাগ করে দেওয়ার এত ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রকে রুখে দিয়ে সচেতন সংগ্রাম গড়ে তোলাই আজ সময়ের ডাক। সেই ডাকে সাড়া দিতে হবে প্রতিটি শোষিত মানুষকে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র নদীয়া জেলার দেবগ্রাম লোকালের কর্মী কমরেড হবিবর রহমান ২৫ আগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

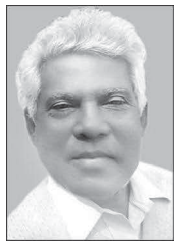

কমরেড হবিবর রহমান ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বেলডাঙা কলেজে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র সাথে যুক্ত হয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। সেই সময় তিনি কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। কলেজে ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার পাশাপাশি তাঁর সহকর্মীদের সাথে যুক্তভাবে পানিঘাটা অঞ্চলে এস ইউ সি আই (সি) দলের সংগঠন বিস্তারে ভূমিকা নেন। কর্মজীবনে স্কুল শিক্ষক হিসাবে তিনি শিক্ষা আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। শাসকদলের ভয়ভীতি ও প্রলোভনকে উপেক্ষা করে তিনি আমৃত্যু দলের আন্দোলনে যুক্ত থেকেছেন।

১ সেপ্টেম্বর, রাধাকান্তপুর রেলগেট পার্শ্বস্থ মাঠে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহু শিক্ষক সহ সমাজের নানা স্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। কমরেড বসির আহমেদের সভাপতিত্বে বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কমরেডস সুজিত ভট্টশালী, সেখ খোদাবক্স, হররোজ আলি সেখ ও অন্যান্যরা।

কমরেড হবিবর রহমান লাল সেলাম

তিন তালাক আইনে কি মুসলিম নারীরা নিরাপত্তা পেলেন?

৩০ জুলাই সংসদে পাশ হয়েছে তাৎক্ষণিক তিন তালাক বিরোধী আইন। বিজেপি মহা সমারোহে প্রচারে নেমেছে, নরেন্দ্র মোদি মুক্তি দিয়েছেন মুসলিম নারীদের। বাস্তবটা কি তাই! বিচার করে দেখা দরকার।

একথা ঠিক, বহু বছর ধরে মহিলা সংগঠনগুলি সোচ্চার হয়েছিল তিন তালাক বাতিলের দাবিতে। শুধু রাজপথে নেমে আন্দোলনই নয়, আইনি লড়াইয়েও তারা নেমেছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষিত তালাকপ্রাপ্ত নারীরা তালাক, বিশেষত তালাক-এ-বিদ্দত বা তিন তালাক প্রথার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কোর্টের কাছে তাঁদের প্রশ্ন ছিল, একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হতে তাঁরা পারছেন না কেন? কেন তাঁদেরকে শুধু নারী হিসাবে দেখা হবে? নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আইনগত সমান অধিকার দেওয়ার এবং লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি তাঁদের দিয়েছে ভারতীয় সংবিধান। এই প্রেক্ষাপটে তালাক, বহুবিবাহ, মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের দ্বারা পরিচালিত সম্পত্তির অধিকারসহ আরও কিছু আইন সম্পর্কিত ১৬টি প্রশ্নের উত্তর চেয়ে জনগণের মতামত চায় ল কমিশন। ফলে গোটা দেশব্যাপী শুরু হয় এই বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা।

বিভিন্ন মৌলবাদী শক্তি একে ধর্মের উপর আঘাত হিসাবে দেখিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। অবশেষে ২২ আগস্ট ২০১৭ সুপ্রিম কোর্ট তিন তালাককে অবৈধ, অসাংবিধানিক এবং বেআইনি বলে ঘোষণা করে। ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ লোকসভায় পাশ হয় তাৎক্ষণিক তিন তালাক বিরোধী বিল। এই বিলটি সে সময় রাজ্যসভায় আটকে যায়। সেটিই পাশ হয়েছে এ বছরের ৩০ জুলাই। যদিও শুধুমাত্র তিন তালাককে ফৌজদারি অপরাধের তকমা দেওয়া ছাড়া এই বিলে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কার্যকরী হতে দেখা গেল না। বিলের বিধান অনুযায়ী একমাত্র তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী বা তাঁর রক্তের সম্পর্কের কোনও আত্মীয় অভিযোগ করলেই এটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। এই আইনে অপরাধীর ৩ বছর পর্যন্ত জেল এবং জরিমানার বিধান আছে। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী, তার পরিমাণ নির্ধারণ করবেন কোনও ম্যাজিস্ট্রেট। নাবালক সন্তানেরা মায়ের কাছে থাকার অধিকারী।

সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং তাৎক্ষণিক তিন তালাক বিরোধী বিল পাশ নারী আন্দোলনের একধাপ জয় সূচিত করেছে। নারীদের দীর্ঘ দিনের গুমরে ওঠা কান্না, চাপা ব্যথাকে এই আন্দোলন যে ভাষা দিয়েছে তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা রাষ্ট্রশক্তির পক্ষেও সম্ভব হয়নি। তা সমাজের চিন্তাশীল মানুষকেও ভাবিয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে এই বিলে তিন তালাক নিষিদ্ধ এবং বেআইনি হিসাবে ঘোষিত হলেও আইনের ফাঁকে রয়েছে অপব্যবহারের সুযোগ। নানা পথে তালাককে পুরুষের হাতে একটি নির্যাতনের হাতিয়ার হিসাবে রেখে দেওয়া হল। নারীকে কিন্তু তালাক কিংবা বিচ্ছেদের অধিকার এই ২০১৯-এও 'ডিজিট্যাল ভারতের' সরকার দিল না। তালাক সংক্রান্ত অভিযোগ করলে অপরাধীর জেল হতে পারে, তার জন্য আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আইন তো আছেই, তিন তালাকের সঙ্গে তা জড়িত করে দেওয়া হচ্ছে কেন? তিন তালাককে ফৌজদারি তকমায় আটকে দেওয়া হল। প্রশ্ন হল, স্বামী জেলে গেলে স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণ শিক্ষা, চিকিৎসার দায়ভার কে গ্রহণ করবে? মহিলারা তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামীর উপর নির্ভরশীল। আজও যে ধর্মান্ধতা সমাজে বিদ্যমান তাতে তালাক নামক শব্দটি স্বীকৃত থেকে গেলে তালাকপ্রাপ্ত নারীকে স্বামীর ঘরে বা শ্বশুরবাড়িতে থাকতেই দেওয়া হবে না। এই আইন এমন কোনও গ্যারান্টি দিচ্ছে না যে, তালাকপ্রাপ্ত নারীকে আশ্রয়হীন এবং গৃহচ্যুত হতে হবে না। স্বামী জেলে গেলে তার আশ্রয় যে শ্বশুর বাড়িতে হবেই তার কোনও গ্যারান্টিও নেই। দ্বিতীয়ত, স্বামী জেল থেকে বেরিয়ে এলেও তালাক শব্দটি সমাজে গ্রহণযোগ্য থেকে গেলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কি বজায় থাকবে? মুসলিম সমাজ কি তা গ্রহণ করবে? এই আইন নিকাহ হালালা প্রথা নিষিদ্ধ করার কথা বলেনি। ফলে একবার তালাক দিয়ে ফেলার পর পুনরায় সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করতে হলে তাকে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। তিনি সহবাসের পর আবার তালাক দিলে তবেই স্ত্রী পূর্বের স্বামীর সঙ্গে পুনর্বিবাহ করে (নিকাহ হালালা) সংসার করতে পারবে। এই অবমাননাকর প্রথা বাতিল না হলে নারীর অধিকার কোথায় প্রতিষ্ঠা হল?

মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের দ্বারা স্বীকৃত বহুবিবাহকে ভারত সরকার আজও মান্যতা দিয়ে চলেছে। ফলে শাস্তি পাওয়ার পরেও স্বামী তার তালাক দেওয়া স্ত্রীকে গ্রহণ না করে আরেকটি বিয়ে অনায়াসেই করতেই পারে। আবার, শাস্তির ভয়ে তালাক না দিয়ে, স্ত্রীকে বিতাড়িত করে বিবাহ করতে পারে স্বামী। কাজেই এই আইনে মহিলাদের সুরক্ষা থাকল না। আসলে এটি পরস্পর সম্পর্কিত এক সমস্যা। গোটা ভারতবর্ষে ব্যাপকহারে বহু বিবাহ চলছে। হিন্দুদের মধ্যেও চলছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে রক্ষাকবচ একটাই, ভারতীয় আইনে হিন্দুদের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। মুসলিম মহিলাদের ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আইনি সুরক্ষা দেওয়া হয়নি।

বর্তমান আইনে বহিরঙ্গে এক ধরনের অবিচার নিরসনের ভাব থাকায় বহু গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মুসলিম ও হিন্দু জনগণ একে সম্মান করছেন। আদালতে খোরপোশ পাওয়া সাধারণ মহিলাদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য। আইন আছে শুধু মাত্র কাগজে কলমে। শুধু মুর্শিদাবাদ জেলার আইনজীবীদের তথ্য অনুযায়ী এই জেলাতেই ৩০ হাজারেরও বেশি খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী মহিলা কোর্টে ধরনা দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত। ১০ বছর, ১৫ বছর মামলা চালিয়ে কেউ একবার, কেউ দু'বার হয়তো খোরপোশ পেয়েছেন, যা প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়।

মৌলবাদীদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন উঠেছে, ধর্মের বিধানকে একটি সরকার কীভাবে নিষিদ্ধ করতে পারে? কিন্তু আমাদের দেশে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামে যে পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা বলা আছে তার কি পরিবর্তন হয়নি? ডঃ ওসমান গনির ব্যাখ্যা অনুযায়ী আরবে পুরুষ বা নারী চুরি করলে হাত পা কেটে দেওয়া হত, সেসব দেশেও আইনের পরিবর্তন হয়েছে। সুদের কারবার ইসলাম অনুমোদন করে না। তা সত্ত্বেও মুসলিমরা সুদ গ্রহণ মেনে নিয়েছেন। ধর্মীয় বিধান মানলে তো ব্যাঙ্ক থেকে সুদ নেওয়াও অপরাধ। এই সব বিধানও পরিবর্তন হয়েছে। চুক্তি, সাধারণ ও ফৌজদারি বিষয় সংক্রান্ত বহু ইসলামি আইনের পরিবর্তে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ হয়েছে। শুধু নারীর অধিকারের প্রশ্নে স্বার্থান্বেষীরা মৌলবাদীরা সোচ্চার হচ্ছেন ধর্মের উপর আঘাত বলে।

ইসলাম ধর্মেই প্রথম নারীদের বিবাহে মত প্রকাশের অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার, বিধবা বিবাহের অধিকার, শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। মহান হজরত মহম্মদের নির্দেশ ছিল, শরিয়তের দ্বারা কোনও সমস্যা সমাধান না হলে মনুষ্যত্বকে কাজে লাগাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তিন তালাক বিলে তালাককে অনুমোদন, যার সঙ্গে যুক্ত নিকাহ হালালা, তা বহাল তবিয়তেই রইল। এটা তো ধর্ষণের অনুমোদনেরই নামান্তর। এই বর্বর প্রথা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বকে কাজে লাগানো হল না। সারা বিশ্ব জুড়ে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ইসলামিক বহু দেশে যুগোপযোগী আইন তৈরি হয়েছে। পরিবর্তনও হয়েছে। অনেক দিন ধরেই কাশ্মীরে তো এই নিয়ম চালু নেই। সেখানে ছেলে-মেয়ে সম্পত্তিতে সমান অধিকার পায়। কোনও কাশ্মীরি নারী বাইরের কাউকে বিবাহ করলেও নারী সম্পত্তিতে বঞ্চিত হয় না, ৩৭০ ধারা চালু থাকা সত্ত্বেও। বিশ্বের প্রায় ২২টি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তন হয়েছে। মরক্কো, টিউনেশিয়া, মালদ্বীপ, ইয়েমেন, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, মিশর, জর্ডন, আলজেরিয়া ইত্যাদি দেশে এই সব প্রথার পরিবর্তন হয়েছে। পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়াতেও তাৎক্ষণিক তালাক সরকার বন্ধ করেছে।

১৯৭৮ সালে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা ৬৫ বছরের শাহবানুকে তালাক দেয় তার স্বামী। স্বামী খোরপোশ দিতে না চাইলে, তিনি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন। ১৯৮৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট খোরপোশের পক্ষে রায় দেয়। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের বিরোধিতায় সেই সময় ১৯৮৬ সালে কংগ্রেস সরকার পার্লামেন্টে আইন পাশ করে সুপ্রিম কোর্টের রায় নাকচ করে দেয়। এইভাবে কংগ্রেস ভোটের স্বার্থে মৌলবাদীদের খুশি করার পথ নেয়। ধারাবাহিকভাবেই কংগ্রেস এই নীতি নিয়ে চলেছে। বর্তমান তৃণমূল সরকারকেও মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক হারানোর ভয়ে তালাক প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা গেল না। এভাবে গণতান্ত্রিক সংস্কার এ দেশে অবহেলিতই থেকে যাচ্ছে।

বিজেপি সরকার দাবি করছে মুসলিম নারীদের আত্মসম্মান, সামাজিক নিরাপত্তা, মর্যাদা দিতে সরকার তিন তালাক বন্ধ করেছে। বিজেপির সভাপতি অমিত শাহ প্রচার করছেন এই বিলের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রামমোহন-বিদ্যাসাগরের পরই আরেকজন সমাজ সংস্কারকের মর্যাদায় ভূষিত হলেন। বিল পাশের পরের দিনই প্রচার মাধ্যমে দেখা গেল বোরখা পরা কিছু মুসলিম মেয়ে নরেন্দ্র মোদির ছবি হাতে নিয়ে উল্লাস করছেন। হয় অজ্ঞতা না হলে গড়া-পেটার খেলা ছাড়া এটা আর কী হতে পারে? তথাকথিত 'হিন্দু ভারত' গড়ে তোলার কারিগরদের এই প্রতারণার দিকটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যে সব প্রশ্নে আইন নিরুত্তর, অসহায় নারীদের সুরক্ষা দিতে অপারগ, সেই শূন্যতা পূরণে মৌলবাদীদের সক্রিয়তা ও সমাজে তাদের কব্জা শক্তিশালী হবে। বিজেপি মুখে প্রগতির জৌলুস, আর বাস্তবে মৌলবাদীদের মদত দিয়ে চলেছে। হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদীদের মধ্যে মিত্রতা তো থাকেই। পুঁজিবাদী শাসকদের কাছে তা শক্তিশালী হাতিয়ার।

মুসলিম নারীদের প্রতি বিজেপির দরদ আসলে কুমিরের কান্না। একদিকে মহাদরদি সেজে সারা দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভোটের অঙ্ক বাড়িয়ে নেওয়া, অন্য দিকে মৌলবাদীদের সন্তুষ্ট করার এক নয়া কৌশল নিয়েছে বিজেপি। বিজেপি দাবি তুলেছে, তারাই মুসলিম মেয়েদের রক্ষাকর্তা। অথচ কাশ্মীরের কাঠুয়াতে আট বছরের কচি মেয়ে আসিফার ধর্ষকদের রক্ষা করতে তারাই মিছিল করেছে। সমস্ত দিক দিয়েই তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। সারা দেশে গোরক্ষার নামে মুসলিমদের খুন করাচ্ছে তারা। জয় শ্রীরাম না বলার অপরাধে চরম লাঞ্ছনা ও নির্যাতন হয়েছে হিন্দু দলিত সহ মুসলিম যুবকদের উপর। নিপীড়িত হয়েছেন নারীরাও।

বিজেপি নেতারা মুসলিমদের মাঝে মাঝেই বাংলাদেশে, পাকিস্তানে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। যে বিজেপি নেতারা মুসলিম মহিলাদের আত্মসম্মান এবং সামাজিক নিরাপত্তার চ্যাম্পিয়ান সাজার চেষ্টা করছেন, তাঁরা আয়নায় একবার নিজেদের মুখ দেখুন। আমাদের দেশে দলিত, তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ, এমনকি যুক্তিবাদীরাও তাদের হাতে নিরাপদ নয়। সাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টিকারী এই বিজেপি যুক্তিবাদী, মুক্তমনা গবেষক, লেখক নরেন্দ্র দাভোলকর, গোবিন্দ পানসারে, এম এম কালবুর্গি, গৌরী লঙ্কেশ, সুজাত বুখারি সহ বহু যুক্তিবাদীর কণ্ঠ রোধ করতে তাঁদের হত্যা করেছে। এঁরা তো জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন। তাঁদের খুন করাল কেন বিজেপি মদতপুষ্ট হিন্দুত্ববাদীরা? কর্নাটকের বিজেপির এক নেতা বলেছেন, আরএসএসের নীতির বিরুদ্ধে না গেলে এদের মরতে হত না। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে লড়ার 'অপরাধে' ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রপথিক রামমোহন রায়কে বিজেপি 'ভক্ত'রা ব্রিটিশের দালাল বলে গালাগালি দিয়ে চলেছে। আর সেই বিজেপি মুসলিম নারীর অধিকারের আওয়াজ তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। বাস্তবে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অপব্যাখ্যা করে তিন তালাক বিলের দ্বারা তালাক প্রথাকেই কার্যত রক্ষা করেছে বিজেপি। নরেন্দ্র মোদি সরকার এভাবে প্রতারণার পথে মুসলিম নারীদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত করলেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস পালিত

৫ আগস্ট ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি। (ডাইনে) সমাবেশের একাংশ

৫ আগস্ট দলের আন্দামান-নিকোবর আইল্যান্ড প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে লিট্‌ল আন্দামানে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা

ফসলের দাম, কৃষিঋণ মকুব, বিনামূল্যে বিদ্যুতের দাবিতে বারাসতে বিক্ষোভ

২৯ আগস্ট, পাট-ধান সহ সব ফসলের লাভজনক দাম, কৃষিঋণ মকুব, জবকার্ড হোল্ডারদের কাজ, সার-বীজ-বিদ্যুৎ সহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্য কমানো ইত্যাদি দাবিতে কয়েকশো চাষি উত্তর ২৪ পরগণা জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। অল ইন্ডিয়া কিষাণ-খেতমজদুর সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন ব্লকের কৃষকরা এবং জেলা কমিটির সভাপতি স্বপন দেবনাথ ও জেলা সম্পাদক দাউদ গাজী।

খরা ঘোষণার দাবিতে পুরুলিয়া, বীরভূমে বিক্ষোভ

পুরুলিয়া ঃ অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেতমজদুর সংগঠনের পুরুলিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে ৩০ আগস্ট জেলাশাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। পাঁচ শতাধিক কৃষক ও খেতমজদুর এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। পুরুলিয়া স্টেশন থেকে মিছিল পোস্ট-অফিসের মোড়, হাটতলা হয়ে জেলাশাসক দপ্তরে যায়। সংগঠনের জেলা সম্পাদক সহ পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল দাবিপত্র পেশ করেন। পুরুলিয়া জেলাকে খরা কবলিত ঘোষণা করা, মদমুক্ত এলাকা তৈরি করা, খরা সমস্যার স্থায়ী সমাধান সহ দশ দফা দাবিতে এই কর্মসূচি পালিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড সীতারাম মাহাত, সাগর আচার্য, অনিল বাউরি, অনুপ মাহাত প্রমুখ।

বীরভূম ঃ ফসলের লাভজনক দাম দেওয়া, কালোবাজারি বন্ধ করে সস্তায় সার-বীজ-কীটনাশক প্রদান করা, জেলাকে খরা ঘোষণা করে আর্থিক সুবিধা দেওয়া সহ পাঁচ দফা দাবি নিয়ে ৩০ আগস্ট বীরভূম জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেতমজদুর সংগঠনের সদস্যরা। তাঁরা জেলা প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেন।

ঝাড়খণ্ডে শহিদ ক্ষুদিরাম মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদ

ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলা খারসাওয়াঁ জেলার চাণ্ডিল গোলচক্করে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। সে মূর্তি ভেঙে দেয় একদল দুষ্কৃতী।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির উপর এহেন ন্যক্কারজনক আক্রমণের প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন ঝাড়খণ্ডের ছাত্র-যুব-মহিলা সহ সর্বস্তরের মানুষ। অভিযোগ, আরএসএসের মদতে এই জঘন্য ঘটনা ঘটেছে। আরএসএস ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধতা করেছে বারবার। ক্ষুদিরামের স্মৃতি, রামমোহনের চিন্তাধারা, বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ড তাদের কাছে অসহ্য। এই জঘন্য ঘটনার প্রতিবাদে ৩০ আগস্ট অল ইন্ডিয়া ডি এস ও জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। আন্দোলনের চাপে জেলাশাসক দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং মূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন।

নন্দীগ্রামে বিক্ষোভ

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সমস্ত গরিব মানুষের নাম অন্তর্ভুক্ত করা, এলাকায় সুষ্ঠু জল নিকাশি, অতি বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসলের ক্ষতিপূরণ, সকলের ডিজিটাল কার্ড, কৃষি শ্রমিকদের ২০০ দিনের কাজ ও ৩০০ টাকা মজুরি, গরিব পরিবারকে রিলিফ, মদ ও মাদক প্রসার রোধ ও নারী নিগ্রহ বন্ধ, বিধবা ও বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার দাবিতে ২৯ আগস্ট নন্দীগ্রাম বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখায় এস ইউ সি আই (সি) এবং বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ডেপুটেশনের পূর্বে একটি সুসজ্জিত মিছিল নন্দীগ্রাম বাজার পরিক্রমা করে। সমগ্র কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমরেডস মনোজ দাস, আরতি খাটুয়া, অসিত প্রধান, বিমল মাইতি প্রমুখ। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং যেগুলি তাঁর পক্ষে কার্যকর করা সম্ভব তা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

মেদিনীপুরে কৃষক-খেতমজুর জবকার্ড হোল্ডারদের বিক্ষোভ

২০০০ টাকা কুইন্টাল দরে ধান কেনা, জবকার্ড হোল্ডারদের ২০০ দিন কাজ, দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরি, আবাস যোজনায় গরিবদের পাকা বাড়ি, বিধবা ভাতা-বার্ধক্য ভাতা প্রদান, কৃষিঋণ মকুব ইত্যাদি দাবিতে ২৬ আগস্ট পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরে অল ইন্ডিয়া কিষাণ-খেতমজদুর সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পাঁচশোরও বেশি কৃষক-খেতমজুর জবকার্ড হোল্ডার মেদিনীপুর শহর জুড়ে মিছিল করে ডিএম গেটে বিক্ষোভ দেখায় এবং পথ অবরোধ করে। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড প্রভঞ্জন জানা সহ সদের পড়িয়া, বঙ্কিম মুর্মু, বলরাম দাস প্রমুখ।

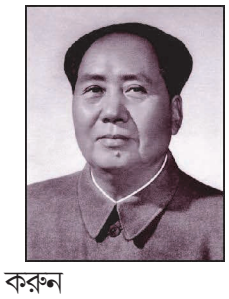

সংগ্রহ করুন

অনুশীলন সম্পর্কে

মাও সে-তুং

দাম ঃ ১০ টাকা

বেহাল রাস্তা সারানোর দাবিতে জয়নগরে অবরোধ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোচারণ থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রাস্তার দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থা। খানা-খন্দে ভরা এই রাস্তায় রোগী দূরের কথা সুস্থ মানুষও চলতে পারছেন না। গাড়ি চলাচলের প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়েছে রাস্তাটি। বারবার বিডিও, এসডিও-কে জানিয়েও কোনও উপায় না হওয়ায় এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে এলাকার মানুষ ২৮ আগস্ট রাস্তা অবরোধ করেন।

সকাল ১০টা ৫০ থেকে শুরু হয়ে প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ চলার পর জয়নগর থানার আইসি এসে অবরোধ তোলার কথা বললে স্থানীয় জনসাধারণ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরে আইসি মাইকে ঘোষণা করেন যে, তিনি বিডিও, এসডিও-র সাথে কথা বলেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন জেলাপ্রশাসন অবিলম্বে রাস্তা সারানোর ব্যবস্থা নেবে। এরপর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

কর্মসংস্থানের দাবিতে জেলায় জেলায় যুববিক্ষোভ

২৮ আগস্ট, উত্তর ২৪ পরগণা

হুগলি ঃ সকল বেকারের কাজ নতুবা উপযুক্ত পরিমাণ বেকার ভাতা প্রদান, ঠিকা প্রথা বাতিল ও সমস্ত শূন্য পদে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ, ১০০ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করা, মদ-জুয়া-অশ্লীল বিজ্ঞাপনের প্রসার বন্ধ করা, নারীর মর্যাদা রক্ষা সহ বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্তের বিরুদ্ধে

হুগলি

এআইডিওয়াইও-র হুগলি জেলা কমিটির আহ্বানে ২৬ আগস্ট যুবকরা জেলাশাসক দপ্তরের বিক্ষোভ দেখায়।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড গোপাল সাহা, কমরেড সুশান্ত পাল প্রমুখ। প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ডি ওয়াই ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড পার্থ দে। সংগঠনের হুগলি জেলা সভাপতি কমরেড সুমন ঘোষের নেতৃত্বে তিন জনের প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন।

উত্তর ২৪ পরগণা ও বাঁকুড়া জেলাতেও এআইডিওয়াইও ও জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় ও ডেপুটেশন দেয়।

মুর্শিদাবাদ ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারিকরণ বন্ধ, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ, নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতি-স্বজনপোষণ বন্ধ, পঞ্চায়েতগুলিতে ১০০ দিনের কাজের সঠিক রূপায়ণ,

বাঁকুড়া

চুঁয়াপুর ও পঞ্চাননতলা রেললাইনের উপর দু'টি উড়ালপুল নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার এবং মুর্শিদাবাদে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে ২৯ আগস্ট জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন দেয় এআইডিওয়াইও-র জেলা কমিটি। বহরমপুর শহরের গ্রাণ্ট হলের সামনে থেকে মিছিল করে জেলাশাসক দপ্তরে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এখানে বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড

মুর্শিদাবাদ

সঞ্জয় বিশ্বাস ও জেলা সম্পাদক কমরেড আরিফ খন্দকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আন্দোলনের পথে মিড-ডে মিল কর্মীরা

বাঁকুড়ায় বিক্ষোভ

২৮ আগস্ট চার শতাধিক মিড-ডে মিল কর্মী জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। বছরে বারো মাসের বেতন এবং বেতন বৃদ্ধি, মিড-ডে মিলের আর্থিক ও অন্যান্য দায়িত্ব স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে দেওয়া, রান্না ও পরিবেশনের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা, রান্নার কাজে গ্যাসের ব্যবস্থা করা, ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাবার ও পরিস্রুত, পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি দাবিতে কর্মীদের সুসজ্জিত মিছিল বাঁকুড়া শহর পরিক্রমা করে, জেলাশাসকের দপ্তরে পৌঁছায়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের জেলা সভাপতি কমরেড সুজিত রায়, বাঁকুড়া ১ নং ব্লকের পক্ষে অপর্ণা বরাট, ২ নং ব্লকের পক্ষে মুক্তা বাগদি। ইউনিয়নের রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কর্মী কমরেড সনাতন দাস। ৭ জনের একটি প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করে।

স্বরূপনগরে সম্মেলন

মাসিক ভাতা দেড় হাজার টাকা, ৪ জনের টাকা ভাগ হয় ১০ জনের মধ্যে, তাও আবার বছরে পাওয়া যায় দশ মাসের—এ ভাবেই সরকারের বদান্যতায় বেগার খাটেন মিড-ডে মিল কর্মীরা। এর প্রতিবাদে ও স্থায়ী সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি সহ ১০ দফা দাবিতে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগর ব্লক প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৫ আগস্ট। সভাপতিত্ব করেন সন্ধ্যারানী আমিন, বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি অশোক দাস, রাজ্য নেতা শ্যামল রাম প্রমুখ। বেলা পালকে সভাপতি ও মাধবী বিশ্বাসকে সম্পাদক করে ১৮ জনের ব্লক কমিটি নির্বাচিত হয়।

স্বাস্থ্য আধিকারিককে ডেপুটেশন মুর্শিদাবাদের গ্রামীণ চিকিৎসকদের

উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নন-রেজিস্টার্ড চিকিৎসকদের স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে স্বীকৃতি, সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্থায়ীভাবে নিয়োগ, জনমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক সিলেবাস ও কারিকুলাম জানিয়ে ইনফরমাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের প্রতিটি ব্লক স্তরে যথার্থ প্রশিক্ষণ শুরুর তারিখ ঘোষণা, নন-রেজিস্টার্ড চিকিৎসকদের অযথা প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ, হাসপাতালে উপযুক্ত পরিকাঠামো, ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকেল স্টাফ, জীবনদায়ী তথা প্রয়োজনীয় অন্যান্য স্বাস্থ্যসামগ্রীর পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং প্রকৃত ফ্রি চিকিৎসার সুব্যবস্থা, সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারিকরণ বন্ধ, আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবিতে প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ২৯ আগস্ট মুর্শিদাবাদে ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি ডাক্তার রবিউল আলম, সভাপতি ডাক্তার গোলাম জিকিরিয়া, মজিবুর রহমান, সানোয়ার হোসেন প্রমুখ। স্বাস্থ্য আধিকারিক তাঁর অধীনস্থ বিষয়গুলো সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে জানান।

ছাত্রী ধর্ষণ ঃ কোলাঘাটে এসপি দপ্তরে বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুরে কোলাঘাটের যোগীবেড় গ্রামের এক স্কুলছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ছাত্রীটির পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবিতে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন ও নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে ১ সেপ্টেম্বর এস পি অফিসে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা।

পুঁজির সর্বগ্রাসী লোভে বিপন্ন সভ্যতা

জ্বলছে আমাজন অরণ্য। পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে 'পৃথিবীর ফুসফুস' আমাজনের সবুজ বনানী যা জোগান দেয় বেঁচে থাকার অপরিহার্য উপাদান অক্সিজেনের মোট প্রয়োজনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ, শুষে নেয় ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইডের বিপুল অংশ। বিপন্ন হয়ে পড়ছে এই অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের প্রায় ৪০০ গোষ্ঠীর মানুষের জীবন। ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ৪০ হাজার প্রজাতির গাছ-গাছালি, ৩ হাজার প্রজাতির মাছ, ১৩০০ প্রজাতির পাখি, ৪২৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী সহ বনের জীবকুল। বিপন্ন হচ্ছে আশপাশের এলাকায় বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্যও।

প্রায় ৫৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের আমাজন অরণ্যের প্রায় ৬০ ভাগ রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে। অথচ আগুন লাগার পর তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও এই মারাত্মক বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে সেখানকার প্রেসিডেন্ট, দক্ষিণপন্থী 'সোস্যাল লিবেরাল পার্টি'র নেতা জেয়ার বোলসোনারোকে বিশেষ উদ্বিগ্ন ও তৎপর হতে দেখা যায়নি। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ব্রাজিলের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র আইএনপিই জানাচ্ছে, শুধু এ বছরেই আমাজনের জঙ্গলে ৭২ হাজার ৮৪৩টি দাবানলের ঘটনা ঘটেছে যা গত বছরের তুলনায় ৮৩ শতাংশ বেশি। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, আমাজনের মতো একটি বৃষ্টি-অরণ্যে (রেইনফরেস্ট), যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি, সেখানে বার বার এভাবে আগুন লাগছে কীভাবে এবং অগ্নিকাণ্ড এত দিন ধরে চলতেই বা পারছে কী করে। অভিযোগ উঠছে, প্রাকৃতিক কারণে নয়, এই আগুন ইচ্ছাকৃত ভাবে লাগানো হয়েছে। জঙ্গলের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, সেখানকার বিপুল জলসম্পদ ও মাটির নিচে থাকা মূল্যবান খনিজ সম্পদের উপর দখলদারি কায়েম করতে বৃহৎ পুঁজির মুনাফাবাজ মালিকরা আমাজন অরণ্যের বিভিন্ন স্থানে, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বার বার আগুন লাগাচ্ছে। এবং এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের পিছনে রয়েছে ব্রাজিলের দক্ষিণপন্থী সরকারের মদত। যার প্রতিনিধি প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো।

২০১৮-র অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন বোলসোনারো। তার বহু আগে থেকেই ব্রাজিলের পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ ও আইনগুলির বিরোধী তিনি। নির্বাচনী প্রচারে নেমে বোলসোনারো পুঁজিপতিদের ঢালাও প্রতিশ্রুতিও দেন যে, প্রেসিডেন্ট পদে বসে আমাজন অরণ্যের সংরক্ষিত অঞ্চলগুলি ব্যবসার জন্য খুলে দেবেন। একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ওই অরণ্যের ৬৮টি সংরক্ষিত এলাকা এখন আগুনের গ্রাসে।

প্রেসিডেন্ট পদে বসার কয়েক মাস পরে এ বছরের জানুয়ারিতে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ)-এর সভায় বোলসোনারো এক 'নতুন ব্রাজিল' তৈরির রূপরেখা পেশ করেন। তাঁর সেই 'নতুন' ব্রাজিলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষত আমাজন অরণ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়ে কৃষি ও খনি ব্যবসার দিগন্ত খুলে দেওয়ার কর্মসূচি দাখিল করেন তিনি। এই সভায় উপস্থিত বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রপ্রধানদের মুখে সেদিন আপত্তির টুঁ শব্দটিও শোনা যায়নি। অথচ মাঝে মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, পরিবেশ রক্ষায় এঁরা কতই না উদ্বিগ্ন, বড় বড় সভা করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তার প্রচার করতে। কিন্তু ধনী পুঁজিবাদী দেশগুলির অপরিণামদর্শী মুনাফালোভের কারণে বিশ্ব-উষ্ণায়নের যে বিপদ গোটা পৃথিবীতে ঘনিয়ে এসেছে, তা থেকে রেহাই পেতে নির্দিষ্ট কার্যক্রম নিতে এতটুকু উদ্যোগী নন এইসব রাষ্ট্রপ্রধানরা। ছলে বলে কৌশলে এর দায় তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্যই যত ব্যগ্রতা তাঁদের। ফ্রান্সে সাতটি শক্তিধর পুঁজিবাদী দেশের সংগঠন জি-৭-এর সাম্প্রতিক সভায় বিশ্বের এই বড়কর্তাদের আমাজন রক্ষায় খুব উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁ থেকে শুরু করে জার্মানির চ্যান্সেলর মের্কেল— সকলেই আমাজন অরণ্যকে বাঁচানোর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করেছেন, ব্যবসা বন্ধের হুমকিও দিয়েছেন। কিন্তু এসবই যে বিশ্ববাসীর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য নেহাত বলতে হয় তাই বলা, নানা ঘটনাক্রমে তা স্পষ্ট। বাস্তবে আমাজনের আগুন নেভাতে যতটা তাঁরা আগ্রহী, তার থেকে তাঁদের ঢের বেশি উৎসাহ আগুনে পুড়ে যাওয়া আমাজনের বিস্তৃত অংশগুলিকে কৃষি-ব্যবসা আর খননের জন্য বেসরকারি বহুজাতিক পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিতে। মার্কিন

জ্বলছে অরণ্য গলছে হিমবাহ

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্বয়ং টুইট করে আগুন নেভাতে ব্রাজিলকে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছেন। পাশাপাশি বলেছেন, "আগামী দিনে আমাদের (ব্রাজিল ও আমেরিকা) মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা খুবই উদ্দীপনাময়। আমাদের সম্পর্ক দৃঢ়, হয়তো আগের তুলনায় দৃঢ়তর" (পলিটিকো ডট কম, ২৩ আগস্ট, '১৯)। এই মন্তব্যের পর তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বিশেষত যখন জানা যায়, গত ২৬ আগস্ট জি-৭-এর বৈঠকে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত আলোচনাসভায় যেখানে আমাজনের আগুন ছিল অন্যতম আলোচ্য বিষয়, সেখানে তিনি যোগদান করারও প্রয়োজন বোধ করেননি।

শুধু কি এই? বিশ্ব পুঁজিবাদের ইঞ্জিন বলে খ্যাত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্প্রতি গ্রিনল্যান্ড কিনে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি যা বলেছেন, মুখ ফুটে না বললেও দুনিয়ার আরও কয়েকটি ধনী পুঁজিবাদী দেশের কর্তাদের মনোবাসনা আলাদা কিছু নয়। উত্তর মেরুবৃত্তের অন্তর্গত বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ বরফে ঢাকা গ্রিনল্যান্ড এখন সকলেরই আগ্রহের বিষয়। এর কারণ কী? এর পিছনেও যে রয়েছে বৃহৎ পুঁজির মালিকদের মুনাফার আগ্রাসী লালসা, মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট মাইক পম্পেয়োর কথা থেকেই তা স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, উত্তর মেরুবৃত্তে বরফ গলে বাণিজ্যিক জাহাজ পরিবহণের সহজ একটি রাস্তা তৈরি হয়েছে। এই রাস্তায় আমেরিকা থেকে এশিয়ায় পণ্য নিয়ে যেতে সময় লাগবে অনেক কম। খরচ কমবে ব্যবসায়ীদের। পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক ম্যানেজার ট্রাম্প সহ অন্যান্য দেশের কর্তাদের শকুনের দৃষ্টি তাই এখন গ্রিনল্যান্ডের উপর। পুঁজিবাদী রাশিয়া ইতিমধ্যে মেরুবৃত্তে ২৭টি সামরিক ঘাঁটি তৈরি করে ফেলেছে। চীনও গ্রিনল্যান্ডে বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগের ছক কষছে।

তাছাড়া গ্রিনল্যান্ডের বরফের নিচে রয়েছে খনিজ সম্পদের বিপুল ভাণ্ডার, যা মুনাফালোলুপ পুঁজিপতিদের কাছে অত্যন্ত লোভনীয়। এতদিন দুর্ভেদ্য বরফের আস্তরণ থাকায় এই খনিজের নাগাল পাওয়া যেত না। এখন পুঁজিবাদী কার্যকলাপের অপরিণামদর্শী প্রসারের কারণে সৃষ্টি হওয়া বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে মেরুবৃত্তের বরফ গলছে। সুযোগ মিলছে খনিজ সম্পদ উত্তোলনের। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করছে গোটা বিশ্বের ধনী পুঁজিবাদী দেশগুলি নিজের নিজের দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের মুনাফার ভাণ্ডার আরও ভরিয়ে তুলতে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যে বলছেন, উত্তর মেরুবৃত্তে পুঁজিবাদী কার্যকলাপ অনেক গুণে বাড়িয়ে তুলবে বিশ্ব-উষ্ণায়নের বিপদ, যার ফলে ধ্বংসের পথে চলে যাবে গোটা দুনিয়া! সেখানকার হিমবাহ দ্রুত গলে বাড়িয়ে তুলবে সমুদ্রতলের উচ্চতা। তলিয়ে যাবে অসংখ্য ভূ-ভাগ। বিপন্ন হবে মানুষ। তার বেলা?

কুছ পরোয়া নেহি! কারণ বিশ্ব জুড়ে এখন বিরাজ করছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যার একমাত্র লক্ষ্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। মুনাফার এই লোভ এতখানি প্রবল যে মানবিকতা, মূল্যবোধ রক্ষা দূরের কথা, মানবসভ্যতার কেবলমাত্র অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখার জন্যও এমনকি পুঁজিপতিদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। আমাজন অরণ্যের আগুন বা গ্রিনল্যান্ডের খনিজ সম্পদের দখলদারি— এসবের ফলে বিশ্ব-উষ্ণায়নের তীব্রতা বেড়ে গিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ যে চূড়ান্ত বিপন্ন হয়ে পড়ছে, বিপন্ন হয়ে পড়ছে মানুষ সহ গোটা জীবজগতের অস্তিত্ব, বিজ্ঞানীরা বার বার হুঁশিয়ারি দেওয়া সত্ত্বেও কর্ণপাত করছে না বৃহৎ পুঁজির মালিক ও তাদের রাজনৈতিক ম্যানেজার দেশ-বিদেশের পুঁজিবাদী সরকারগুলি। এভাবে চললে প্রকৃতির আসন্ন বিপর্যয়ের সর্বনাশা পরিণতি থেকে রেহাই পাবেন না কেউই, এমনকি খোদ পুঁজিপতিরা নিজেরাও— এ কথা জানা সত্ত্বেও যেন মৃত্যুকূপে ঝাঁপ দিতে ছুটে চলেছে বৃহৎ পুঁজির মালিক ও তাদের শাসনাধীন রাষ্ট্রগুলি।

আসলে এটাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দস্তুর। মুনাফার লোভই পুঁজিবাদের চালিকাশক্তি। এই ব্যবস্থার ভিত্তি হল মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ— শ্রমিক শ্রেণির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে অল্প কয়েকজন পুঁজিমালিকের বিপুল মুনাফার অধিকারী হওয়া। নিজেদের মধ্যেকার হিংস্র প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা লুঠের এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি, পরিবেশ কোনও কিছুরই তোয়াক্কা করলে চলে না পুঁজিপতি শ্রেণির। শুরু থেকেই তারা তা করেওনি। যত দিন গেছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সংকট জর্জরিত হয়ে মুমূর্ষু হয়েছে। ক্রমাগত বাজারসংকট গ্রাস করেছে তাকে। আজ এই ব্যবস্থার নির্মমতা আক্ষরিক অর্থেই সীমাহীন। মুনাফা লুঠের রথে চড়ে চোখ কান বুজে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া— পুঁজিবাদের এটাই একমাত্র ভবিতব্য। তাই মানবসভ্যতাকে রক্ষা করার দায়িত্ব দেশে দেশে সাধারণ মানুষের। পুঁজিবাদী এই বিধ্বংসী লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে তাদেরই সংগঠিত ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। রাস্তাও একটাই— সেটি হল এই সর্বনাশা আত্মধ্বংসী শোষণমূলক ব্যবস্থাটিকে সমূলে উচ্ছেদ করা। এ ছাড়া মানুষের আর বাঁচার উপায় নেই। (তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ ও ৩০ আগস্ট, '১৯)

মদ-গাঁজা ও বার-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন আন্দামানে

১৮ আগস্ট লিটল আন্দামানের বিবেকানন্দপুর গ্রামে বার খোলার বিরুদ্ধে মা দুর্গা মহিলা সংঘ ও এডুকেশন্যাল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা ও স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান হয়। প্রতিবাদ সভায় শতাধিক মহিলা ও নানা অংশের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। আন্দামান প্রসাশনের হিসেব অনুযায়ী, ২০১৭-২০১৮ অর্থবর্ষে প্রায় সাড়ে ৭৭ লক্ষ কার্টন মদ বিক্রি হয়েছে এবং তা থেকে ১৫৬১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬ হাজার টাকা সরকার আয় করেছে। এত মদের প্রসার বহু সামাজিক সমস্যারও জন্ম দিয়েছে, যার বিরুদ্ধে কালচারাল অর্গানাইজেশন আন্দোলন করে যাচ্ছে। (সূত্র ঃ আনিডকো-র ওয়েবসাইট)

সভা থেকে প্রস্তাব নেওয়া হয়, মদমুক্ত আইল্যান্ডের দাবিতে লিটল আন্দামানের অন্যান্য গ্রামের মহিলাদের নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

পরিচয়পত্র আদায় দর্জি শ্রমিকদের

দর্জি শ্রমিকদের সরকারি পরিচয়পত্র, পেনশন, স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ, সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের দাবিতে সারা বাংলা গার্মেন্টস (দর্জি) শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে কয়েক বছর ধরে আন্দোলন চলছে। তারই ধারাবাহিকতায় এক বছর আগে গৌর গোপাল জানাকে সভাপতি ও সুব্রত বেরাকে সম্পাদক নির্বাচিত করে গড়ে উঠেছে ইউনিয়নের সাগর ব্লক কমিটি। এই ব্লক কমিটির উদ্যোগে সাগর দ্বীপের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে গড়ে উঠেছে পাড়া ও বাজার কমিটি। ২৪ আগস্ট রুদ্রনগরের সাগর মঙ্গল স্কুলে এক অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ জন শ্রমিকের হাতে সরকারি পরিচয়পত্র তুলে দেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা নেতৃত্বের পক্ষে সুবীর দাস।

২৯ আগস্ট সাগর ব্লকের বামনখালি প্রগতি মডেল স্কুলে প্রায় ৩০ জন মহিলা সহ শতাধিক দর্জি শ্রমিকদের উপস্থিতিতে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সনৎ দাসকে সম্পাদক করে ১৯ জনের কমিটি গঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ও স্থানীয় ক্লাবের সম্পাদক শ্যামল দাস। এই সম্মেলনে এলাকার মানুষের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগায়। পরিচয়পত্র প্রদান ও এই আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সালা বাংলা গার্মেন্টস (দর্জি) শ্রমিক ইউনিয়নের পশ্চিম বাংলার আহ্বায়ক নন্দ পাত্র সাগর ব্লক কমিটিকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বি-শত জন্মবার্ষিকী আগতপ্রায়। সেই উপলক্ষ্যে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য।

(৮)

নারী মুক্তি আন্দোলনে বিদ্যাসাগর

উনিশ শতকের বাংলার সমাজে বহু কুপ্রথা চালু ছিল যাতে দুর্ভোগ সহ্য করতে হত মূলত মেয়েদেরই। তখন 'বাল্যবিবাহ প্রথা' চালু ছিল। মেয়েদের ৬-৭ বছর বয়সে বিয়ে দিতে হত। না হলে সমাজে ওই মেয়েদের স্থান থাকত না। সেই পরিবারকে একঘরে করে সমাজচ্যুত করা হত। একঘরে হওয়ার ভয়ে মা বাবা ৬-৭ বছরেরও কম বয়সেই বালিকার বিয়ে দিত। পাত্র না পাওয়া গেলে এমনকি অশীতিপর বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দিয়েও সমাজে ঠাঁই পেতে হত।

চালু ছিল বহুবিবাহ প্রথা। পুরুষরা একাধিক বিয়ে করতে পারত। একেক পুরুষ ৭০-৮০টি করেও বিয়ে করতেন। সব স্ত্রীর খোঁজও রাখতেন না, অধিকাংশ মেয়েরাই থাকত বাবার বাড়িতে। পিতৃগৃহেও ওই মেয়েদের অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হত। স্বামী মারা গেলে এই সব মেয়েদের জীবন হয়ে উঠত আরও করুণ। ওই বালিকা-বিধবাদের মাথার চুল কেটে দেওয়া হত, একবেলা খেতে দেওয়া হত। তাও আবার নিরামিষ। সমস্ত বারব্রততে উপোস করতে হত। অকল্যাণের ভয়ে কোনও শুভ কাজে বা বাড়ির আনন্দ অনুষ্ঠানে এই বালিকাদের যোগ দিতে দেওয়া হত না, ঘরে আটকে রাখা হত। এই সব অসহায় বালবিধবাদের সারাজীবন কাটত দীর্ঘশ্বাস আর বঞ্চনার মধ্য দিয়ে। অথচ পুরুষদের ছিল যা খুশি করার অধিকার। কোনও নিয়মকানুনও তাদের মানতে হত না। এ ভাবে নিষ্ঠুর পুরুষতান্ত্রিক হিন্দু সমাজ নারীজন্মকে করে তুলেছিল চরম দুর্দশার।

নারীজীবনের এই দুর্দশা ও চোখের জল ছেলেবেলায় যেমন বিদ্যাসাগরের কোমল মনে ব্যথা দিয়েছিল, তেমনি কর্মজীবনেও নারীর দুঃখময় জীবন তাঁকে কাঁদাত। জীবনে তিনি যেমন অগণিত বালবিধবার চোখের জল দেখেছেন, তেমনি বহুবিবাহ প্রথার ফলে মেয়েদের অসহায় কান্নাও দেখেছেন অনেক।

এরকম কত মেয়েকে নিরুপায় হয়ে ভিক্ষে করতে হয়েছে, আত্মহত্যা করতে হয়েছে, অবমাননাকর পথে জীবন রক্ষা করতে হয়েছে তা বিদ্যাসাগর খোঁজ নিয়ে দেখেছেন। এ সম্পর্কে তিনি হুগলি জেলার ১৩৩ জন ব্রাহ্মণের বিবাহ সংখ্যার একটি তালিকা তৈরি করে দেখান যে, হিন্দু সমাজে বহুকাল থেকে প্রচলিত চার বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হওয়ায় কুলীন ব্রাহ্মণেরা তার সুযোগ নিয়ে কীভাবে কৌলিন্য প্রথাকে হীনস্বার্থে ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ হল এই রকম—

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বয়স-৫৫, স্ত্রী সংখ্যা-৮০। ভগবান চট্টোপাধ্যায় বয়স-৬২, স্ত্রী সংখ্যা-৭২। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় বয়স-৪০, স্ত্রী সংখ্যা-৫৬। এইরকমই ছিল কৌলীন্য প্রথার নির্মম জঘন্য ইতিহাস। এই পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে এনে বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন সমাজে এই কুপ্রথা যারা নীরবে মেনে নিতেন সেইসব মানুষের মধ্যে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে মানসিকতা গড়ে তুলতে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নারীমুক্তি আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দিয়েছিলেন তিনি।

তাঁর আগে সমাজে নানা কুপ্রথার দ্বারা অবমানিত নারীদের মুক্তির ভাবনা দেখা গিয়েছিল কিছু ব্যক্তি ও সংগঠনের মধ্যে। বিচ্ছিন্নভাবে তাঁরা চেষ্টাও শুরু করেছিলেন। বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভ নিজের বিধবা মেয়ের বিবাহের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতদের বাধায় এগোতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের প্রায় একশো বছর আগে ঘটেছিল এই ঘটনা। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'তেও বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে আলোচনা হত। এরপর 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনেও নারীমুক্তির কথা উঠেছিল। তাঁদের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এ বিধবা বিবাহ নিয়ে লেখালিখিও হয়েছে। কিন্তু কোনওটাই দানা বাঁধতে পারেনি।

কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত চিন্তাগুলিকে তিনি পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক সমাজচিন্তায় পরিণত করেন। সমাজ জুড়ে সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্বকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তিনি। সমাজপ্রগতির অভিমুখে সেদিনের সামাজিক চাহিদার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠেন তিনি। সেই জন্যই তাঁকে বলা হয় ভারতীয় সমাজবিপ্লবের অগ্রদূত বা পথিকৃৎ।

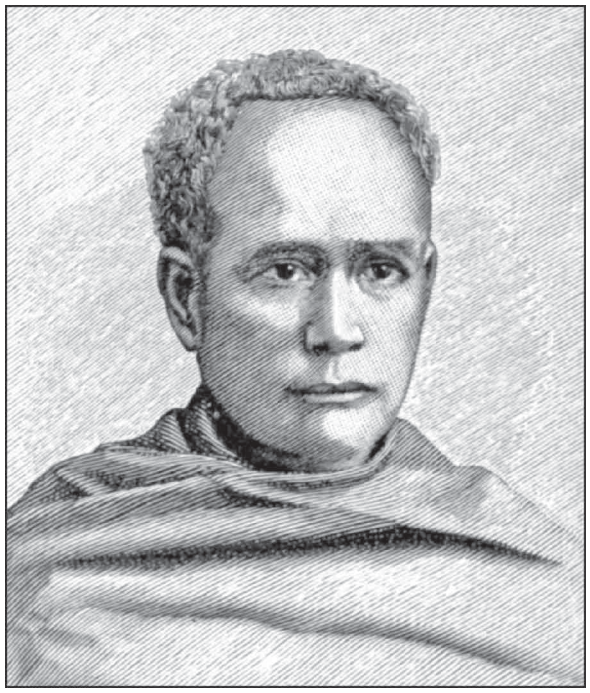

তিনি বুঝেছিলেন নারীদের দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করার পথে সমাজ যেমন বাধা, তেমন নারীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনও একটি বাধা। নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না ঘটালে তাঁর চেষ্টা সফল হবে না বুঝে তিনি একই সঙ্গে নারীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হন। এর জন্য তাঁকে বহু বাধার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে, অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে।

বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত আন্দোলনের এই ধারা আত্মস্থ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত চিন্তাগুলিকে তিনি পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক সমাজচিন্তায় পরিণত করেন। সমাজ জুড়ে সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্বকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তিনি। সেই জন্যই তাঁকে বলা হয় ভারতীয় সমাজবিপ্লবের অগ্রদূত বা পথিকৃৎ।

বিধবাদের যন্ত্রণা দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে যদি বিবাহ করাটা শাস্ত্র বিরুদ্ধ না হয়, তা হলে নারীর ক্ষেত্রে তা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হবে কেন? তাই রাতের পর রাত জেগে কঠোর অনুশীলন করে সমস্ত শাস্ত্র তিনি পড়তে শুরু করেছিলেন। নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহ করার কোনও বিধান শাস্ত্রে আছে কি না তা খোঁজার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠছিলেন। কারণ, শাস্ত্রের প্রমাণ পেলে কুসংস্কারগ্রস্তদের মুখ বন্ধ করা সহজ হবে। অবশেষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ মিলল। প্রবল উৎসাহে সেই প্রমাণ সহ বিধবা বিবাহের পক্ষে প্রচার শুরু করলেন তিনি। 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামে দু'খানি বই লিখলেন। প্রবল আলোড়ন পড়ে গেল হিন্দু সমাজে। সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে তিনি পক্ষে টানতে চাইলেন। এক একজনকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে আবেদনপত্রে সই করালেন। বিরুদ্ধপক্ষেরা পাল্টা সই করে বিরোধিতা করলেন। তিনি এই গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরও নিজের যুক্তি বোঝাতে চাইলেন। শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের নিয়ে একটা বিচারসভা ডাকলেন। সব শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিয়ে বললেন, 'শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমি যা জানি দেখিয়েছি, তা মানা না মানা আপনাদের ইচ্ছে। তা ছাড়া শাস্ত্রে আছে এই আমার প্রধান যুক্তি নয়। আমার আবেদন আপনাদের হৃদয়ের কছে, বুদ্ধির কাছে।'

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা বললেন, 'আপনার কথা ঠিক, কিন্তু প্রত্যেক লোক যদি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা বুদ্ধির কৌশল অনুসারে চলে, তা হলে তো সমাজ দু'দিনে উচ্ছন্নে যাবে। এই জন্যই শাস্ত্র, যা শাসন করে।'

বিদ্যাসাগর বললেন, 'শাস্ত্রও যুগে যুগে বদলেছে। কারণ শাস্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়।' বিদ্যাসাগরের কাছে মানুষ বড় হলেও এইসব পণ্ডিতদের কাছে মানুষের চেয়ে শাস্ত্র বড়। যুক্তি দিয়ে সত্য নির্ধারণ করা এঁদের বিচারের বিষয় নয়। তাই কোনও যুক্তিতেই বিদ্যাসাগর এঁদের পক্ষে আনতে পারলেন না। তিনি যাতে বিধবা বিবাহ আইন চালু করতে না পারেন সেই চক্রান্তে মেতে উঠলেন তাঁরা। তাঁর নামে ব্যঙ্গ করে ছড়া লেখা হল, তাঁকে হত্যার চক্রান্ত কর হল। মানুষের তৈরি অন্যায় বিধান এভাবে নারীর উপর নির্দয় অত্যাচার করবে তা বিদ্যাসাগর মেনে নিতে পারেননি। প্রবল বাধার বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ ও একাগ্র চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই 'বিধবা বিবাহ আইন' চালু হল। তখন তাঁর বয়স ৩৬ বছর। আইন চালু হল বটে কিন্তু তাকে কাজে লাগাতে গোঁড়া হিন্দু সমাজের মাথারা প্রবল বাধা দিল। অনেক কষ্ট করে বিধবা বিবাহ করতে কাউকে রাজি করালে তাকে ভয় দেখানো হত, শারীরিক নির্যাতন করা হত, এক ঘরে করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হত। বিদ্যাসাগর এই সব বাধার বিরুদ্ধে নিজে পাত্র-পাত্রী ঠিক করে, সব খরচ নিজে বহন করে দাঁড়িয়ে থেকে বিধবা বিবাহ দিতে শুরু করলেন। বিয়ের পর অনেকের সংসার চালানোর খরচও তিনি বহন করতেন। এজন্য তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন, দেনায় ডুবে গিয়েছেন, তবু পিছিয়ে যাননি। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরান্মুখ নহি।' অর্থাৎ এ জন্য মরতেও তিনি রাজি ছিলেন— এমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল তাঁর।

বিধবাদের বিবাহের জন্য বিদ্যাসাগরের সহানুভূতি ও সাহায্য নিয়ে একদল সুবিধাবাদী লোক তাঁকে ঠকাতে শুরু করেছিল। তারা টাকার লোভে বিধবাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিত, কেউ বা টাকা নিয়ে আর বিয়ে করত না, আবার কেউ বিয়ে করে কয়েক দিন পরে সেই বিধবাকে ছেড়ে পালিয়ে যেত। তখন ওই অসহায় মেয়েটির সব খরচ বিদ্যাসগরকেই বহন করতে হত। এমনি করেই অসহায় নারীর চোখের জল মোছাতে তিনি ঋণ করে করে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

বাল্যবিবাহ প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা ও পণ প্রথার মতো নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথার উচ্ছেদ করতেও তিনি চেষ্টা করেছিলেন। এই সব কুপ্রথার বলি হয়ে মেয়েদের যে দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করতে হত তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন। অতি দুঃখে তাই লিখেছিলেন—'যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সৎ অসৎ বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকতা রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।'

বাল্য বিবাহেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। নিজেরে মেয়েদের তাই তিনি বেশি বয়সেই বিয়ে দিয়েছেন।

একদিন শিবনাথ শাস্ত্রী বড় মেয়ে হেমলতাকে নিয়ে বিদ্যাসাগরের বাড়ি যাচ্ছেন। হেমলতার বয়স তখন ১৬ বছর। ৬-৭ বছরে মেয়েদের বিয়ে না দিলে তখন খুব দুর্নাম হত। অথচ হেমলতার তখনও বিয়ে হয়নি। পথে হেমলতা বলল—'আচ্ছা বাবা, এত বয়সেও তুমি আমার বিয়ে দাওনি, এজন্য পণ্ডিতমশায় তোমায় কিছু বলবেন না তো।'

শিবনাথ বললেন, 'বিদ্যাসাগর সবরকম কুসংস্কারের বিরোধী, অতএব তোমার দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই মা।'

বিদ্যাসাগরের বাড়িতে পৌঁছানো গেল। নানা কথাবার্তার পর শিবনাথ পথে হেমলতা যা বলেছিল, সে কথা খোলাখুলি বললেন বিদ্যাসাগরকে। কথা শুনে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন বিদ্যাসাগর। তারপর হেমলতাকে বললেন—'কি গো, তুমি কি ভাবো, বেশি বয়সে মেয়ের বিয়ে দেবার ব্যাপারে তোমার বাবাই খুব বাহাদুর। তুমি বুঝি জানো না, বিয়ের সময় আমার মেয়েদের বয়স তোমার থেকেও বেশি ছিল।'

আশ্বস্ত ও মুগ্ধ হলেন হেমলতা।

(চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

পুজো কমিটিকে মুখ্যমন্ত্রীর অনুদানে জনস্বার্থ নেই

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে জানিয়েছেন— "বহু বছর ধরে এই রাজ্যে দুর্গাপুজো চলে আসছে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে সাধ্যমতো চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে। কিন্তু অতীতে কোনও সরকার পুজো কমিটিগুলোকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেনি। আপনার সরকার গত বছর থেকে আর্থিক অনুদান দেওয়া শুরু করেছে কেবল নয়, এবছর থেকে তা আড়াই গুণ বৃদ্ধিকরেছে। বিশেষ করে এই ঘোষণা এমন এক সময়ে করা হয়েছে যখন আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, এএনএম, মিড-ডে মিল কর্মী থেকে শুরু করে প্যারাটিচার সমেত নানা স্তরের শিক্ষকরা প্রায় প্রতি দিন বেতন ও সাম্মানিক ভাতা বাড়ানোর দাবিতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এবং আপনার সরকার আর্থিক ঘাটতির অজুহাতে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করছে শুধু নয়, তা দমন করছে। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি এই পদক্ষেপ আপনার দলের নির্বাচনী রাজনীতিতে ফয়দা দিলেও সামগ্রিকভাবে জনস্বার্থবিরোধী। আমরা এই সরকারি ঘোষণা প্রত্যাহারের দাবি করছি।"

রাজ্য জুড়ে তীব্র ছাত্র আন্দোলনের ডাক এ আই ডি এস ও-র

৩১ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর এ আই ডি এস ও-র একাদশতম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার শহরে। এই সম্মেলন দাবি তোলে অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু করতে হবে, শিক্ষাধ্বংসকারী জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ বাতিল করতে হবে। অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস, সিবিসিএস ও সেমেস্টার প্রথা বন্ধ, মেডিকেলে এনএমসি বিল বাতিল, মদ ও মাদকদ্রব্যের প্রসার রোধ এবং নারী নির্যাতন বন্ধ করার দাবিও গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল ছাত্রপ্রতিনিধিদের সামনে। রাজ্য জুড়ে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেয় সংগ্রামী ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র এই সম্মেলন।

৩১ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ। প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীর দৃপ্ত মিছিল ওই দিন কোচবিহার শহর পরিক্রমা করে উপস্থিত হয় পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়া মাঠে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ নৃপেন্দ্র নাথ পাল। প্রকাশ্য অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড মৃদুল সরকার। বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(সি) -র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র, সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কমল সাঁই এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি কমরেড মাসুদ রানা, ডিএসও-র আসাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রোজ্জ্বল দেব, সিকিমের ডিএসও নেতা ভানুভক্ত শর্মা।

২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম হলে (কমরেড দেবকুমার মণ্ডল মঞ্চ) অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি অধিবেশন। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে প্রায় ৩০০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। শিক্ষার সমস্ত শাখা থেকে আসা প্রতিনিধিরা শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা এবং তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিনিধি অধিবেশনের শেষে বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। এই সম্মেলন থেকে কমরেড সামসুল আলমকে সভাপতি ও কমরেড মণিশংকর পট্টনায়ককে সম্পাদক করে ২৫ জনের সম্পাদকমণ্ডলী, ৭৮ জনের রাজ্য কমিটি এবং ১০২ জনের রাজ্য কাউন্সিল নির্বাচিত হয়।

প্রতিনিধি অধিবেশনের একাংশ। উপরে অধিবেশন শেষে বক্তব্য রাখছেন কমরেড সৌমেন বসু

৩১ আগস্ট শহিদ দিবস স্মরণ

১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহিদ ও ১৯৯০ সালের বাস-ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি ও মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের শহিদ কমরেড মাধাই হালদার স্মরণে ৩১ আগস্ট সকালে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এবং বিকাল ৩টায় এসপ্লানেডে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করা হয় ▶

◀ *কমরেড মাধাই হালদারের শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা*

১ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি) সহ বাম দলগুলির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যৌথ মিছিল কলকাতার মৌলালি মোড় থেকে শুরু হয়ে মহাজাতি সদনে শেষ হয়

বিএসএনএল-এর ঠিকা শ্রমিকদের আন্দোলনের পাশে এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (সি)-র প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল বি এস এন এল-এর কলকাতা শাখায় অনশনকারী ঠিকা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিগুলি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকেও এ বিষয়ে তৎপর হওয়ার জন্য ২৮ আগস্ট চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, ১৬ আগস্ট থেকে এই কর্মীরা অনশন করছেন। তাঁদের দাবি ১) সাত মাসের বকেয়া বেতন অবিলম্বে দিতে হবে, ২) কাজের দিনসংখ্যা মাসে ২৬ দিন থেকে কমিয়ে ২০ দিন করা চলবে না, ৩) শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে, ৪) ফোর-জি পরিষেবা চালু করতে হবে এবং বি এস এন এলের আধুনিকীকরণ করতে হবে। প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক দীর্ঘ ২০-২৫ বছর ধরে এই সংস্থায় ঠিকা শ্রমিক হিসাবে কাজ করছেন। ডাঃ মণ্ডল এঁদের সমস্যা উপলব্ধি করে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকেই সক্রিয় হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

জনবিরোধী কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন

খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতির জনস্বার্থ বিরোধী দিকগুলি বাতিল করা এবং শিক্ষার স্বার্থে অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু করা সহ ১৯ দফা দাবিতে ৩০ আগস্ট অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। রাজ্যপাল স্মারকলিপি গ্রহণ করে বিষয়গুলি পর্যালোচনা সাপেক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী, সম্পাদক কার্তিক সাহা, অধ্যাপক প্রদীপ দত্ত, দিলীপ মাইতি এবং স্বপন চক্রবর্তী। কমিটির উপরোক্ত দাবিতে এলাকায় এলাকায়, জেলায় জেলায় আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com